১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের সাংবিধানিক অধিকার খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন তৈরি করে। স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে ঐ কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না। ফলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করে। পাশাপাশি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা স্তরে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দেশজোড়া বিভিন্ন হরতালে কমিশনকে কালো পতাকা দেখিয়ে আওয়াজ তোলা হয়েছিল 'সাইমন ফিরে যাও'।

সাইমন কমিশন-বিরোধী উদ্যোগগুলির ফলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজ অর্জনের কথা ঘোষণা করে। গান্ধিকে

সাইমন কমিশন-বিরোধী গণআন্দোলন।

সামনে রেখে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল গুজরাটের ডান্ডিতে অভিযান করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন গান্ধি। সমুদ্রের তটভূমি থেকে একমুঠো লবণ তুলে গান্ধি প্রতীকীভাবে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে অস্বীকার করেন।

তারপর দ্রুতই দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ জনতা

হরতাল ও বিক্ষোভে যোগ দিতে থাকে। সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি বিদেশি দ্রব্য বয়কট করা শুরু হয়। কৃষকরা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয় সরকার। ব্যাপক সংখ্যায় নারীরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

টুকরো কথা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে পাঠানরা আইন অমান্য আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন অহিংস গান্ধিবাদী সংগ্রামী। তাঁদের

সংগঠনটির নাম ছিল খুদা ই-খিদমদগার। লাল রং-এর কুর্তা পরতেন বলে তাঁদের লালকুর্তা বাহিনীও বলা হতো। গান্ধি-অনুগামী হওয়ার সুবাদে আবদুল গফফর খান 'সীমান্ত গান্ধি' নামেও পরিচিত হন। পেশোয়ারে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সিপাহিরা অহিংস আন্দোলনকারীর উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। মণিপুরি ও নাগাদের মধ্যেও আইন অমান্য আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছিল। নাগা অঞ্চলে তরুণী রানি গিদালো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে

খান আবদুল গফফর খান। মূল ছবিটি নন্দলাল বসু-র আঁকা।

গ্রেফতার করে। ১৯৩০-এর দশকে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে সিলেট, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকার প্রচলিত দমননীতির সাহায্য নিয়েছিল। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকেও কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় আনা হয়েছিল। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে একটি বৈঠক ডাকে। ঐ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা। কংগ্রেস ঐ বৈঠক বয়কট করে। ফলে দ্বিতীয়বার বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধিকেও ঐ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার

জন্য রাজি করায় ব্রিটিশ সরকার। তার পাশাপাশি লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধির একটি চুক্তি হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি বিদেশি কাপড় বর্জন করা ও ভূমিরাজস্ব কর না দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯৩২থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ আন্দোলনের জন্য জেলে যান। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য বিশেষ সফল হয়নি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন নিঃশর্তভাবে তুলে নেওয়া হয়। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনে কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। যেমন অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছিল তেমনটা ১৯৩০

খ্রিস্টাব্দে দেখা যায়নি। পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মানুষের যোগদান আইন অমান্য আন্দোলনে কম ছিল। একইভাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে শ্রমিকরাও কম যোগ দিয়েছিলেন। তবে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বেশি সংখ্যায় যুক্ত হয়েছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসও ধীরে ধীরে সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছিল। সেদিক থেকে গান্ধির স্বরাজের আদর্শ থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেস।

লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধি। মূল ছবিটি দ্য সানফ্রান্সিসকো এক্সামিনার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

গান্ধি-আরউইন চুক্তি

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ গান্ধি ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকে দিল্লি চুক্তিও বলে। সেই চুক্তিতে ঠিক হয় অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দিদের ব্রিটিশ সরকার ছেড়ে দেবে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা চলবে না। দমনমূলক আইনগুলি সরকার তুলে নেবে। এসবের বদলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করবে। পাশাপাশি লন্ডনে দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধি যোগ দেবেন। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় গান্ধি হতাশ হন। ফলে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

টুকরো কথা

১৯৩০-এর দশকে কয়েকটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান

মাস্টারদা সূর্য সেন ও জালালাবাদের যুদ্ধ

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটে। ঠিক হয় যে, একই সঙ্গে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ আর বরিশালে আক্রমণ চালানো হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। অস্ত্রাগার লুঠ করার পরে ২২ এপ্রিল বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। সেখানে ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হয়। এই

লড়াইয়ে বিপ্লবীদের ১১জন নিহত হন। এরপর গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনার কর্মসূচি নিয়ে বাকি বিপ্লবীরা জালালাবাদ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। সূর্য সেনের সঙ্গে ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, হিমাংশু সেন, বিনোদ দত্ত প্রমুখ। সূর্য সেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

বিনয়-বাদল-দীনেশ ও অলিন্দ অভিযান

বিনয়

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৮ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। তাঁদের সাহায্য করলেন রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন। বিনয়,বাদল,দীনেশ

বাদল

রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দে ঢুকে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনসহ আরও দু-জনকে হত্যা করেন। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে গুলির লড়াই। শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ার আগে বাদল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ক-দিন পরে আহত বিনয়ের মৃত্যু হয়। দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁরও ফাঁসি হয়।

দিনেশ

ভগৎ সিং

পঞ্জাবে চন্দ্রশেখর আজাদ-এর প্রতিবাদী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির সদস্যপদ নিয়েছিলেন ভগৎ সিং। পরে ভগৎ নিজে তৈরি

করেন নওজোয়ান ভারত সভা সংগঠন। ভগতের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ বিশমিল, আসফাকউল্লা। কাকোরি স্টেশনে রেল ডাকাতির অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৫ খ্রি:) করে। এই মামলায় রামপ্রসাদ বিশমিল, আসফাকউল্লাসহ চারজনের ফাঁসি হয়। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে নিহত লালা লাজপত রাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং লাহোরের পুলিশ সুপার স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভা কক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা

ফেলেন ও দু-জনেই স্বেচ্ছায় ধরা দেন। সেই ঘটনায় বিপ্লবী রাজগুরু ও সুখদেওসহ অনেকে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ প্রশাসন এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। সেই মামলার রায়ে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ভগৎ সিং, সুখদেও ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক' কথাটিকে ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীরা জনপ্রিয় করেন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধির অহিংস-সত্যাগ্রহের আদর্শ সবসময়ে টিকে ছিল না। গান্ধি নিজেই 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ডাক দিয়ে আন্দোলনের মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি তাঁর বক্তব্য ছিল ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাক,

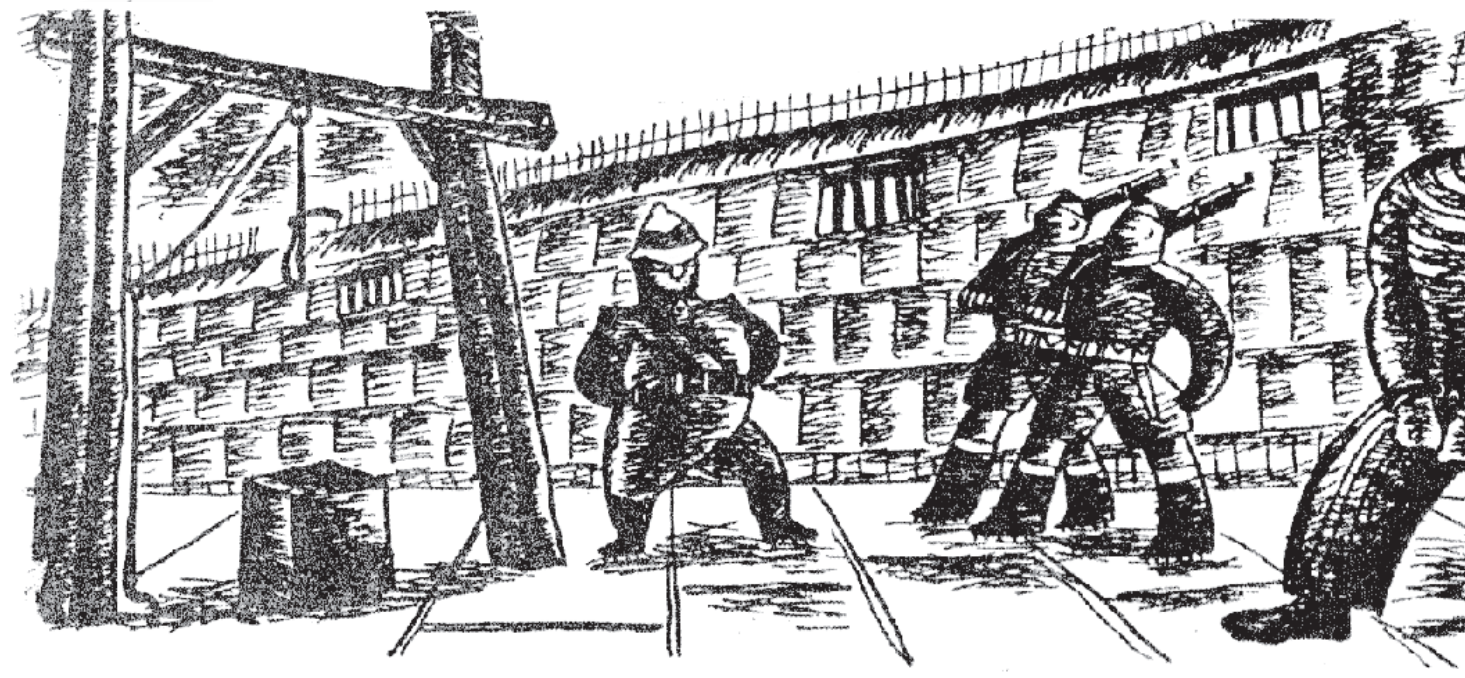

তারপর যে পরিস্থিতিই হোক তার দায়িত্ব গান্ধি নিজে নেবেন। পাশাপাশি ভারতজোড়া আন্দোলনে নানান অংশের জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ঐ বছরে ৯ অগস্ট ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতাদের গ্রেফতার করে। সেই দিন নেতৃত্ববিহীন সাধারণ মানুষ ভারতের নানান জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। বস্তুত, নেতাহীন আন্দোলন যে অতদূর চলবে তা কংগ্রেস-নেতৃত্বও ভাবতে পারেনি।

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি নানান জায়গায় জনগণের সঙ্গে পুলিশ ও সেনা বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল। শহরে ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যায়ে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। অগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে শহর থেকে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র গ্রামের দিকে সরে যেতে থাকে। ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকরা

আন্দোলনে যোগ দেন। বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হয়। এমনকী কয়েকটি অঞ্চলে আন্দোলনকারীরা 'জাতীয় সরকার' তৈরি করেছিলেন।

টুকরো কথা

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর

জনৈক মিলমালিক খাদ্যশস্য পাচার করতে গেলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘাত বাধে। তারপর থেকে তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর অনেক মানুষ মিছিল করে থানায় বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। তমলুকের বৃদ্ধা বিদ্রোহিণী মাতঙ্গিনী হাজরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান। কিছু দিন পরে ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুরের

জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

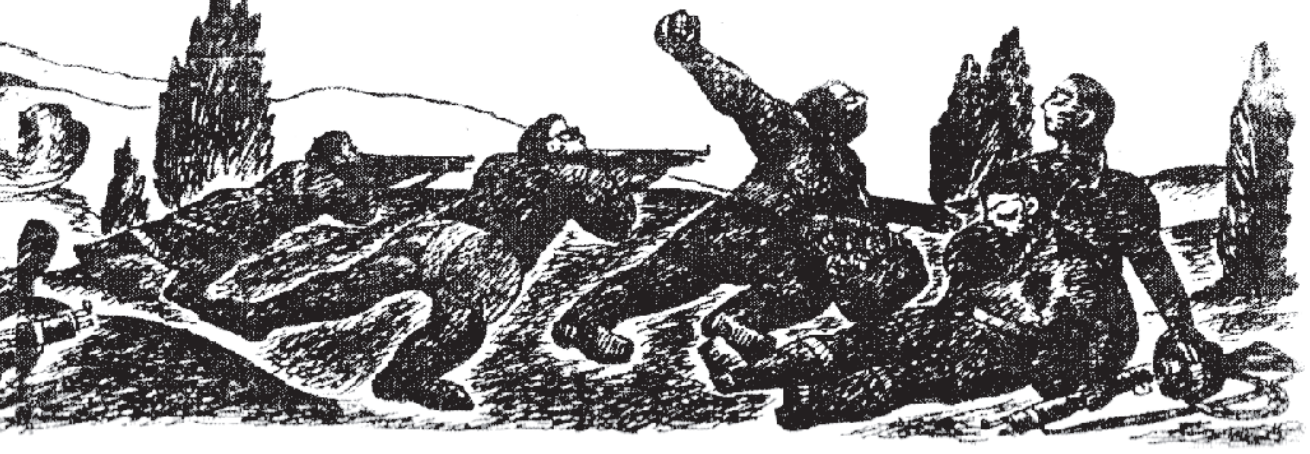

কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সরকারি তরফে যথেষ্ট ত্রাণ পাঠানো হয়নি। ফলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের উদ্যোগেই দুর্গত মানুষদের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করতে থাকেন। পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিদের বাড়তি ধান গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার টিকে ছিল।

মহাত্মা গান্ধি। মূল ছবিটি বাপুজি শিরোনামে নন্দলাল বসু-র আঁকা (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারের তরফে বিরাট সংখ্যক পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছিল। বাস্তবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর এত বড়ো

বিদ্রোহ যে ভারতে আর হয়নি, তা ব্রিটিশ প্রশাসকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। শ্রমিকরা প্রথম দিকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ও কৃষকরাই ছিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূল শক্তি। বস্তুত, কংগ্রেসের সাংগঠনিক হিসেবনিকেশের বাইরে গিয়ে নিজেদের মতো করে কর্মসূচি তৈরি করে নিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার এই আন্দোলন দমন করতে পেরেছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসক বুঝতে পেরেছিল যে দমন-পীড়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না।

টুকরো কথা

ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে একদিকে ভারতে যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন জোরদার, অন্যদিকে পৃথিবীজুড়ে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে একদিকে ছিল জর্মানি, ইতালি ও জাপান। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতকে একতরফা 'যুদ্ধরত দেশ' বলে ঘোষণা করে দেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড জর্মান-আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জাপান জোরকদমে যুদ্ধে যোগ দিলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার

সম্ভাবনা তৈরি হয়। তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সাহায্য পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়াও ভারতীয়দের দাবির ব্যাপারে সহানুভূতি দেখায়। তার ফলে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি দল ভারতে আসে। ক্রিপস প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধের পর ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হবে। এদিকে যুদ্ধের ফলে খাদ্যসংকট ও মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠেছিল। গান্ধিও এই সময় ডাক দেন ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো। এহেন পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র বসু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদাই ছিলেন পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে। তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদ ছাড়া ভারতীয় সমাজের বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে। তিনি একদিকে বিংশ শতকের জর্মান-জাতীয়তাবাদী ভাবধারার শরিক হতে চেয়েছেন। তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শকেও কিছুটা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাংগঠনিক ভাবনাচিন্তাও সুভাষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিতে যোগ দেন, তখন ভারতের সাধারণ জনগণ গান্ধির নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। উচ্চবর্গের আলাপ-আলোচনার বাইরে সাধারণ মানুষেরও যে রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, তা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধির অহিংসার আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হলেও গান্ধির নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন।

কিন্তু বিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। সে সময়ে বাংলার নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বেশ কিছু চিঠিপত্র বিনিময় হয়। সিভিল সার্ভিসে যোগদান না করে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন সুভাষ। বাংলা কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের

সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন তিনি। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় থাকার জন্য অবশ্য তাঁকে জেলে যেতে হয়।

একই জেলে থাকার সময় চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পরিচিত হন। তাই সুভাষচন্দ্রের ভাবনাচিন্তা ও কাজে চিত্তরঞ্জনের প্রভাব ছিল। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দলের সচিব ছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্বরাজ্য দলের তরফে ফরওয়ার্ড পত্রিকার অন্যতম পরিচালকের দায়িত্ব নেন সুভাষ। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জিতে যায়। চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশনের মেয়র হন। সুভাষচন্দ্র প্রধান কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব পান। এই সময়ে

কর্পোরেশনের উদ্যোগে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর জন্য চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য নানারকম কর্মসূচি নেওয়া হয়। এরই মধ্যে অবশ্য সুভাষকে বারবার জেলে যেতে হয়েছিল।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র নিজের উদ্যোগে পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে তিনি নাকচ করেন। এই

সুভাষচন্দ্র বসু

বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে গান্ধির সঙ্গে সুভাষের সংঘাত শুরু হয়।

টুকরো কথা

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ইতিহাসের অধ্যাপক ই. এফ. ওটেনকে ঘিরে একটি ছাত্র-বিক্ষোভ হয়। তার জেরে সুভাষ ও কয়েকজন সহপাঠীকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্র থাকাকালীন কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে টেরিটোরিয়াল আর্মির শাখায় চারমাসের জন্য যোগদান করেন সুভাষচন্দ্র। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অসামরিক জীবন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পাশাপাশি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেন। ইংল্যান্ডের ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাধীন মনোভাব ও তর্ক-বিতর্কের স্পৃহা সুভাষকে মুগ্ধ করেছিল। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুভাষ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আই.সি.এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন সুভাষচন্দ্র।

টুকরো কথা

কংগ্রেসের হরিপুরা ও ত্রিপুরি অধিবেশন

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। কিন্তু ক্রমে গান্ধি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নবীন নেতৃত্বের তিক্ততা বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরি কংগ্রেসে গান্ধি-মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পরে পদ ত্যাগ করে দলের মধ্যেই সহমর্মীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন। পারস্পরিক মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস-নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র ও

শরৎচন্দ্র বসুকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সাসপেন্ড করে। সুভাষকে কংগ্রেসের কোনো নির্বাচিত পদে লড়াই করার ক্ষেত্রে তিন-বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে আলোচনারত মহাত্মা গান্ধি ও সুভাষচন্দ্র বসু।

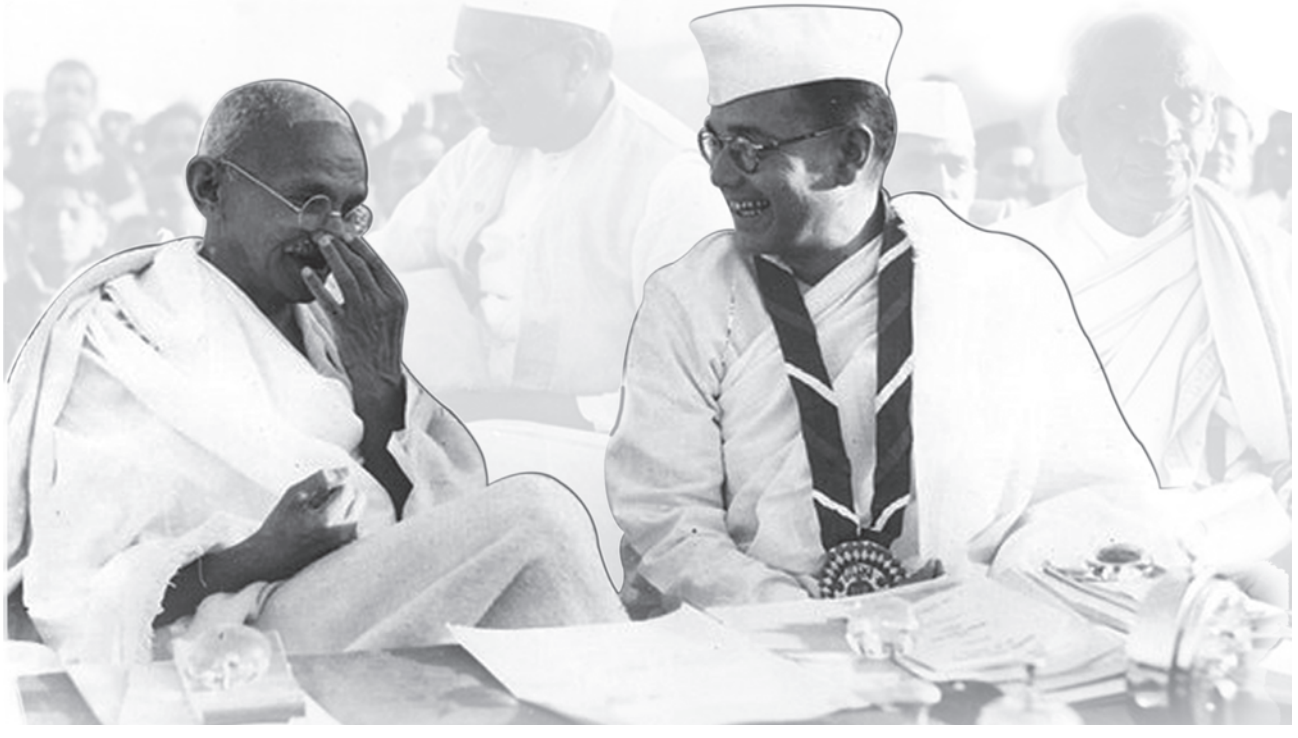

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য শুরু হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে চিকিৎসার জন্য সুভাষকে ইউরোপ যেতে হয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে সুভাষের দেখা হয়। মুসোলিনির দুর্নীতি দূরীকরণ ও সামাজিক সেবা প্রকল্পগুলি সুভাষচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরোনো

রক্ষণশীল নেতৃত্বের আন্দোলনের উপায় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ তরুণ নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ভবিষ্যতের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে যুবসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বৈপ্লবিক কর্মসূচির দাবি তুলেছিলেন। ফলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় কংগ্রেসের কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ, তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বড়ো রকমের ফাটল দেখা দেয়।

এই ঘটনার ফলে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বে রক্ষণশীলদের আধিক্য ও প্রভাব বাড়লেও সাধারণ মানুষ কংগ্রেস সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

চূড়ান্ত অসন্তোষ দেশজোড়া গণঅভ্যুত্থানের পথ তৈরি করছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সেই গণঅভ্যুত্থানের উদাহরণ।

টুকরো কথা

হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর আন্দোলন

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত জুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করার মনস্থ করেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে জনসংযোগ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। তবে সব জায়গায় খুব ইতিবাচক সাড়া পাননি সুভাষচন্দ্র। সেই পরিস্থিতিতে বাংলায় ফিরে সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর আন্দোলন গড়ে তোলেন।

অনেকদিন ধরেই হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকেই মনে করতেন সিরাজ উদ-দৌলার নামে অপবাদ দেওয়ার জন্যই হলওয়েল ঐ কথা বলেছিলেন। ফলে হলওয়েল মনুমেন্টটিও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মানুষজন একজোট হয়। তবে, ঐ আন্দোলন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই সুভাষকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য হলওয়েল মনুমেন্টটি ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, জর্মানির হাতে ব্রিটিশশক্তির পরাজয় হবেই। তাই সেই পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিতে উদ্যোগ নেন সুভাষচন্দ্র।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানে যুদ্ধবন্দি ব্রিটিশ-বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসুর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার নেন। ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে

সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। তিনিই হন তার প্রধানমন্ত্রী ও বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

টুকরো কথা

মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের অন্তর্ধান

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারির মধ্যরাত। কলকাতার ৩৮/২ এলগিন রোডের বসুবাড়ি থেকে দু-জন একটি গাড়ি চেপে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের একজন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। আসলে তিনি ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্র বসু। কিছুদিন যাবৎ নিজের বাড়িতে নজরবন্দি

ছিলেন তিনি। অন্যজন চালকের আসনে সুভাষের ভাইপো শিশিরকুমার বসু। মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পরনে লম্বা, উঁচু-গলা কোট, ঢিলে সালওয়ার। মাথায় কালো টুপি। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা।

গোমো স্টেশনে দিল্লি-কালকা মেলে উঠে বেরিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। পেশোয়ার, কাবুল, ইতালি ও মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন জর্মানির রাজধানী বার্লিনে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়। কিন্তু বার্লিনে হিটলারের তরফে বিশেষ সাহায্য পাননি সুভাষচন্দ্র।

টুকরো কথা

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বান

"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে আমি আজ হইতে আমাদের সেনাবাহিনীর সরাসরি কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলাম। আমার পক্ষে ইহা আনন্দ ও গর্বের ব্যাপার, কারণ একজন ভারতীয়ের কাছে ভারতের মুক্তি ফৌজের (Army of Liberation) সেনাপতি হওয়া অপেক্ষা আর কোনও বড় সম্মান থাকিতে পারে না। আমি যে কার্যভার গ্রহণ করিতেছি তাহার দায়িত্ব যে কত বড় সে সম্পর্কে আমি সচেতন এবং দায়িত্বের গুরুভার আমি বোধ করিতেছি।.... আমি নিজেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর সেবক বলিয়া মনে করি। আমার

কর্তব্য আমি এমনভাবে পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাহাতে আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ থাকে এবং প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, ন্যায় বিচার এবং নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের মুক্তি ফৌজ গঠিত হইতে পারে।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামে, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছার উপর স্বাধীন ভারতের সরকার গঠনে এবং ভারতের স্বাধীনতা চিরদিন রক্ষার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদিগকে একটি সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিতে হবে। এই সৈন্যবাহিনীর লক্ষ্য হইবে মাত্র একটি — ভারতের স্বাধীনতা লাভ, এবং ইচ্ছাও

হইবে একটি — ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা।....

.....

সহকর্মী, অফিসার এবং সৈন্যগণ আপনাদের অকুণ্ঠ সহায়তা এবং অটল আনুগত্যের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তি আনিতে পারিবে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে আমাদেরই চূড়ান্ত জয় হইবে।

আমাদের কার্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, "দিল্লি চলো" ধ্বনি করিতে করিতে আমরা সংগ্রাম করিতে থাকি। যতদিন পর্যন্ত নয়াদিল্লীর ভাইসরয়ের প্রাসাদের শীর্ষে আমাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন না হয় এবং ভারতের রাজধানীতে পুরানো লালকেল্লার ভিতরে আজাদ হিন্দ ফৌজ বিজয়সূচক কুচকাওয়াজ না করে

ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে।”

[২৫ আগস্ট ১৯৪৩ সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে এই নির্দেশনামাটি ঘোষণা করেছিলেন। উদ্ধৃত অংশটি সেই ঘোষণা থেকেই নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

সহযোগীদের সঙ্গে সামরিক পোশাকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু

টুকরো কথা

রানি ঝাঁসি বাহিনী

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের যোগদানের অন্যতম নজির আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি বাহিনী। কংগ্রেসে থাকাকালীনই সুভাষচন্দ্র নারীদের সামরিক কাজে অংশগ্রহণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তিনি নারী সৈনিক তৈরি করার উদ্যোগ নেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম নেতৃত্ব রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম থেকে ঐ বাহিনীর নামকরণ হয় রানি ঝাঁসি বাহিনী। দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার বিভিন্ন অংশের থেকে প্রায় ১৫০০ নারী ঐ বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইম্ফল অভিযানে রানি ঝাঁসি বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে নেমেছিল। ভারতীয় নারীদের আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বনের ধারণা প্রতিষ্ঠার পথে রানি ঝাঁসি বাহিনী প্রেরণা যুগিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে জাপান-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম ব্যাটেলিয়ন রেঙ্গুন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তাঁরা।

এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা অবরোধ করে। কিন্তু আজাদ হিন্দের দুই রেজিমেন্টসহ জাপানের সেনাবাহিনীর ইম্ফল অভিযান বিপর্যস্ত হয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তার ফলে বার্মা-সীমান্ত থেকে জাপান বিমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খাদ্য সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তার উপর রোগ, শীত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য প্রচুর সৈনিক মারা যায়। নানাবিধ সমস্যা ও বাধার ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান সফল হয়নি।

তবুও সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্যের আশাও তিনি

করেছিলেন। জাপান সরকার সুভাষকে রাশিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু যাত্রাপথে তাইওয়ানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। বলা হয় ঐ দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসু মারা গিয়েছেন। তবে ঐ খবরটির সত্যতা সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান শেষ হলেও ভারতের রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। ঐ ফৌজের বহু সেনাকে আত্মসমর্পণের পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভারতে আনা হয়। তাঁদের বিচার শুরু হয় দিল্লির লালকেল্লায়। তাঁদের মধ্যে পি. কে. সেহগাল, জি. এস. ধিলোঁ ও শাহনওয়াজ

খান এই তিনজনকে 'দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগে অভিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার।

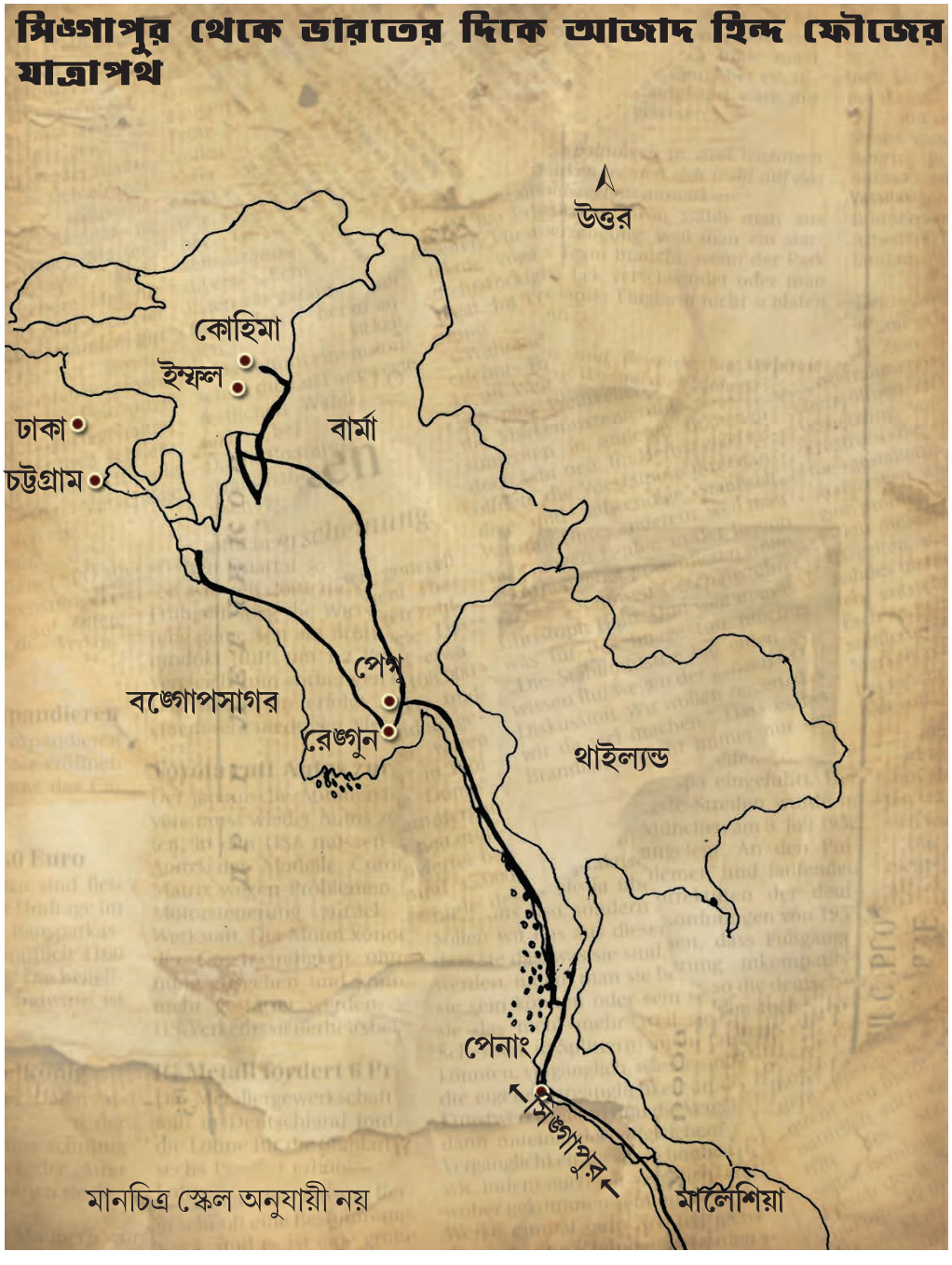

নিজে করো

আগের পাতার মানচিত্রটি থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রাপথের একটা বিবরণ তৈরি করো।

টুকরো কথা

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার ও গণবিক্ষোভ

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার চলাকালীন ভারতীয় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সরকারের কাছে তাঁরা 'দেশদ্রোহী' হলেও, ভারতীয়দের চোখে তাঁরা মহান দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিচার বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য

জনসভা ও মিছিল বেরোতে থাকে। ঐ বাহিনীর অন্যতম সদস্য রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে পথে নামে বাংলার ছাত্রসমাজ। গণবিক্ষোভের আঁচ পেয়ে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা বন্দিদের পক্ষ নিয়ে আদালতে উকিল হিসেবে হাজির হন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল-মিটিংগুলি ব্রিটিশ-বিরোধী হিংসাশ্রয়ী বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সেগুলিতে যোগদান করেন। মনে রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র তাঁর ফৌজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে একসঙ্গে রেখেছিলেন। আলাদা কোনো ধর্মভিত্তিক ব্যাটেলিয়ন তৈরি করেননি। ১৯৪৬

খ্রিস্টাব্দে বিচারাধীন বন্দিদের শাস্তি ঘোষণা হলেও, গণঅভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার পিছু হটে তিন বন্দিকে মুক্তি দেয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইয়ের প্রভাব ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের উপর পড়েছিল। অনেক সৈনিক আজাদ হিন্দ ত্রাণ তহবিলে অর্থদান করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি বা ব্রিটিশ সরকারের নৌবাহিনী প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারতের তাদের শেষের দিন যে ক্রমশই এগিয়ে আসছে তা ব্রিটিশশক্তি বুঝতে পারছিল।

টুকরো কথা

নৌ-বিদ্রোহ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের উপর আঘাত করেছিল। খাবারের খারাপ মান ও বর্ণবৈষম্যের অপমানের বিরুদ্ধে ১৮ ফেব্রুয়ারি 'তলোয়ার' জাহাজের সেনারা (Rating) ধর্মঘট করেন। তাঁদের দাবি ছিল ভালো খাবার ও বেতনে সমতা। তার পাশাপাশি আজাদ হিন্দ বাহিনী ও অন্যান্য রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিও তাঁরা তুলেছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের পতাকা তাঁরা জাহাজের মাস্তুলগুলিতে উড়িয়ে দেন।

কিন্তু ব্রিটিশ-প্রশাসন চূড়ান্ত দমননীতির মাধ্যমে নৌ-বিদ্রোহকে থামানোর চেষ্টা করে। ফলে

ধর্মঘট-প্রতিবাদ দ্রুতই সংঘর্ষের রূপ পায়। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে ভারতের নানা জায়গায় ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষ পথে নামেন। অথচ কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ নৌ-বিদ্রোহীদের থেকে সমর্থন সরিয়ে নেয়। এমনকী মহাত্মা গান্ধিও ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মতোই নৌ-বিদ্রোহীরাও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদেরও ঐ একই সম্মান প্রাপ্য ছিল।

ভারতে নৌ-বিদ্রোহ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে মানানসই খুঁজে নাও :

ক) বিবৃতি : গান্ধি পাশ্চাত্য আদর্শের বিরোধী ছিলেন।

ব্যাখ্যা ১ : গান্ধি রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন।

ব্যাখ্যা ২ : গান্ধি মনে করতেন পাশ্চাত্য আদর্শ ভারতের প্রকৃত স্বরাজ অর্জনের পথে বাধা।

ব্যাখ্যা ৩ : গান্ধি চাইতেন ভারতের সমস্ত মানুষ সরল জীবনযাপন করুক।

খ) বিবৃতি : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন তৈরি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ১ : ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির প্রভাব কমানোর জন্য।

ব্যাখ্যা ২ : ব্রিটিশ-বিরোধী ক্ষোভ ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলি দমন করার জন্য।

ব্যাখ্যা ৩ : ভারতীয়দের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য।

গ) বিবৃতি : গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন

ব্যাখ্যা ১ : ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করার জন্য।

ব্যাখ্যা ২ : তুরস্কের সুলতানের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য।

ব্যাখ্যা ৩ : মুসলমান সমাজের উন্নতির দাবি জোরদার করার জন্য।

ঘ) বিবৃতি : ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বর্জন করেছিল।

ব্যাখ্যা ১ : ভারতীয়রা স্যর জন সাইমনকে পছন্দ করত না।

ব্যাখ্যা ২ : স্যর জন সাইমন ছিলেন ভারতীয়দের বিরোধী।

ব্যাখ্যা ৩ : সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না।

ঙ) বিবৃতি : সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নেন।

ব্যাখ্যা ১ : রাসবিহারী বসুর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য।

ব্যাখ্যা ২ : আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতীয় ভূ-খন্ডে আক্রমণ চালানোর জন্য।

ব্যাখ্যা ৩ : জাপান সরকারকে সাহায্য করার জন্য।

২। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
বিহারের চম্পারন	চিত্তরঞ্জন দাশ
স্বরাজ্য দল	অলিন্দ যুদ্ধ
বিনয়-বাদল-দীনেশ	লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা
ভগৎ সিং	কৃষক আন্দোলন
পট্টভি সীতারামাইয়া	হরিপুরা কংগ্রেস

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ শব্দ) :

ক) দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল?

খ) গান্ধির সত্যাগ্রহ আদর্শের মূল ভাবনা কী ছিল?

গ) স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলনের মূল দাবিগুলি কী ছিল?

ঘ) কাকে, কেন 'সীমান্ত গান্ধি' বলা হতো?

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা কী ছিল?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহ-র আদর্শটি ব্যখ্যা করো। ঐ আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথমদিকের নরমপন্থীদের আদর্শের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

খ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? ঐ আন্দোলন রদ করা বিষয়ে গান্ধির সিদ্ধান্তের সঙ্গে কী তুমি একমত? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) আইন অমান্য আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণের চরিত্র কেমন ছিল? সূর্য সেন ও ভগৎ সিং-এর সংগ্রাম কী গান্ধির মতামতের সহগামী ছিল?

ঘ) জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর উত্থানের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার উপর কোন কোন বিষয় ছাপ ফেলেছিল বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন কী গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ মেনে চলেছিল? নৌ-বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসেবে কীভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবে?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো তুমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী একজন সাধারণ মানুষ। সে বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা এবং দেশে ঐ আন্দোলনে বিভিন্ন মানুষের যোগদান ও উৎসাহ বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

খ) ধরো তুমি একজন সাংবাদিক। সুভাষচন্দ্র বসু একদিন গভীর রাতে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন। পরের পাতায় তাঁর যাত্রাপথের মানচিত্র দেওয়া রইল। সেই মানচিত্র থেকে তাঁর যাত্রাপথ বিষয়ে তুমি একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখো।

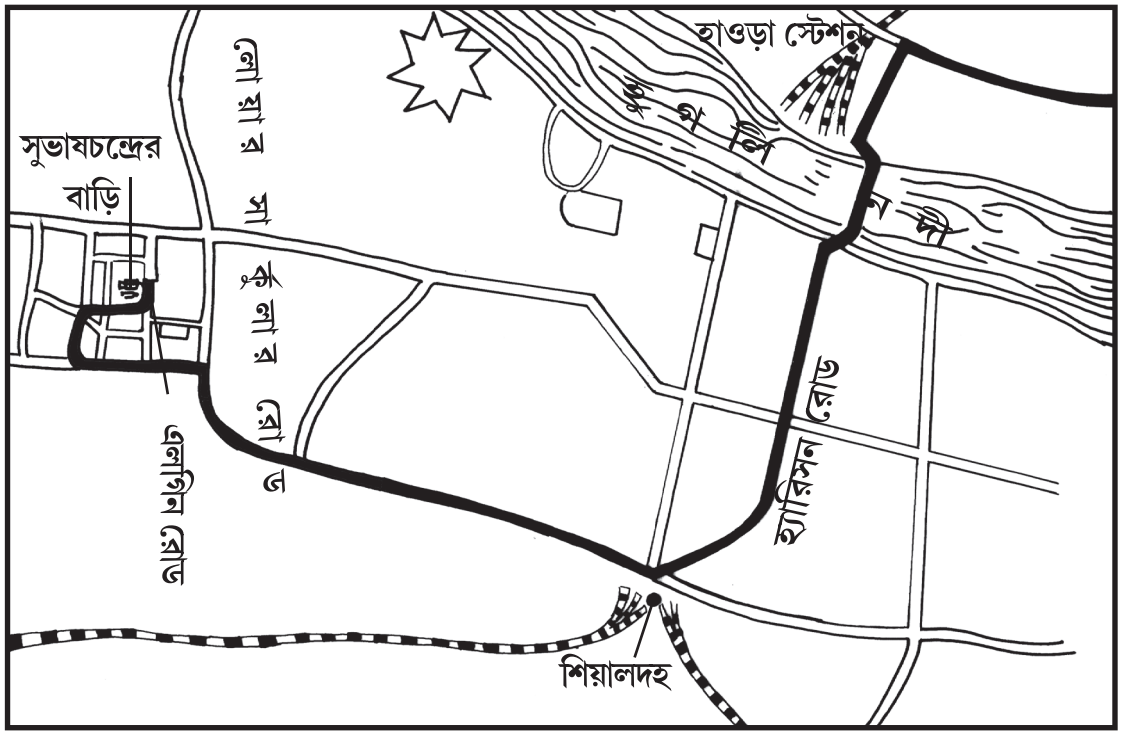

হাওড়া স্টেশন
হুগলি নদী
সুভাষচন্দ্রের বাড়ি
লোয়ার সার্কুলার রোড
এলগিন রোড
হ্যারিসন রোড
শিয়ালদহ

৮ সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে 'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমানরা' ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। হিন্দুস্তান বলতে তখন কেবল উত্তর ও মধ্য ভারতকেই বোঝাতো। অথচ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ঠিক ৯০ বছর পরে সেই হিন্দুস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের উপর দিয়ে চলে গেল ভারত-ভাগের সীমারেখা। বাংলাও দেশভাগের যন্ত্রণাদীর্ণ হয়ে থাকল। অথচ সুলতানি ও মুঘল আমলে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছিল। তাহলে কী এমন হলো যে ঔপনিবেশিক শাসন দেশভাগ দিয়ে শেষ হলো?

ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিকাশ

উনিশ শতকের শেষ দিকেও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সম্প্রদায় বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বোঝাত না। বরং অঞ্চলভেদে মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের তারতম্য ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে

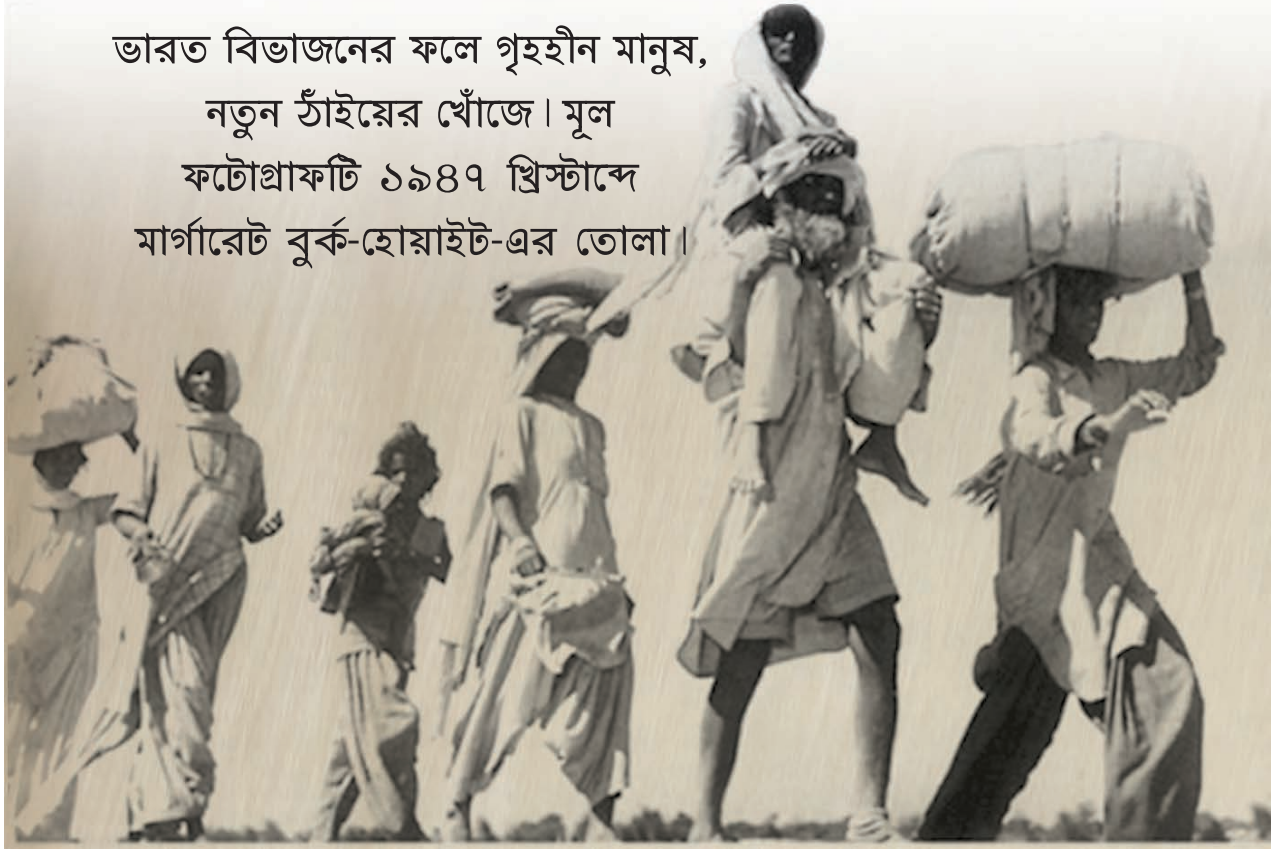

ভারত বিভাজনের ফলে গৃহহীন মানুষ, নতুন ঠাঁইয়ের খোঁজে। মূল ফটোগ্রাফটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট-এর তোলা।

মুসলমান জনসংখ্যার হারেও সমতা ছিল না। বাংলা ও পঞ্জাবে যেমন মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই ছিল মুসলমান। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের মধ্যে যাবতীয় বৈচিত্র্য ও তারতম্যকে মুছে দেয়। বরং ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত মুসলমানকেই একটি ধর্মসম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করতে থাকে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বদলে ধর্মীয় পরিচয়ই মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রধান পরিচয় হয়ে উঠতে থাকে। তার ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের একটা অংশ ব্রিটিশ শাসকের মতো করেই নিজেদের হিন্দুদের থেকে আলাদা একটি সংগঠিত সম্প্রদায় হিসাবে ভাবতে শুরু করে।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা করে দেখত। সেই ভাবেই এক একটি সামাজিক অংশের জন্য এক একরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিত। সেই পদক্ষেপের অন্যতম ছিল আদমশুমারি বা জনগণনা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করবার তাগিদে ব্রিটিশ-নীতির পরিবর্তন ঘটল। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উৎসাহ দিয়ে ভারতীয়ত্বের ধারণাকে আঘাত করতে চেয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার। প্রশাসনের তরফে একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা হয় যে, মুসলমানরা সবাই একই রকম এবং একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

আপাতভাবে ব্রিটিশ-প্রশাসন ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল। সরকারি চাকরি, পড়াশোনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে গুরুত্ব না দেওয়ার কথাই বলা হতো। যদিও কার্যত সরকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে বড়ো করে তুলতো। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ভাগাভাগির প্রশ্নে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে বিভাজন নীতি প্রকট হতো। বিভাজনের এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা হিসাবে ফারসির বদলে ইংরেজিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার হার ছিল কম। ফলে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে

মুসলমানরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে। তুলনায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুরা এগিয়ে যায়। তার ফলে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই মুসলমানদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে, তারা হিন্দুদের তুলনায় বঞ্চিত। অতএব সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমান ও হিন্দুদের অবস্থান পরস্পর-বিরোধী— এই ধারণা পাকাপোক্ত হতে থাকে। যদিও মনে রাখা দরকার যে, মুসলমানদের স্বার্থ বলে যা প্রচার করা হতো তা আসলে শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থ। বিশেষত বাংলার মতো অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক গরিব ও নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদের ভালোমন্দ ঐ স্বার্থচিন্তার মধ্যে থাকত না।

মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের অভিযান শুরু হয় স্যর সৈয়দ আহমদ খান-এর আলিগড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের

সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলন ঘটিয়ে মুসলমান সমাজে আধুনিক উদার মনোভাবের বিকাশ তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্যর সৈয়দ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বা সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার উন্মাদনা তৈরি করতে চাননি। তিনি ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু আধিপত্যের উলটো দিকে মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণিকে স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী মানসিকতা গড়ে তোলা। তিনি বৃহত্তর মুসলমান সমাজের তরফে ব্রিটিশ-শাসনের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সদ্ব্যবহারের উৎসাহ তৈরির চেষ্টা করেন। তাই আলিগড়ে মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের পাঠক্রমে ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বের সহাবস্থান ছিল।

টুকরো কথা

আদমশুমারি ও সম্প্রদায় ধারণা

ভারতীয় সমাজে পৃথক্করণের ধারণা তৈরিতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির জরুরি ভূমিকা ছিল। ঐ জনগণনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বিন্যাসের ধারণাটি পরিষ্কার হয়। পঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যার অর্ধেকই মুসলমান --- সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। আদমশুমারির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার ব্যক্তির ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়কে প্রধান বলে ধরে নিয়েছিল। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের খতিয়ান রাখা হতো আদমশুমারিতে। তাই ঔপনিবেশিক ভারতে সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে ধর্মীয় এবং জাতিগত

পরিচয়কেই প্রধান করে দেখতে থাকে। তার পরিণতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সংঘর্ষের পরিণতি ঘটে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যর উত্থানের মধ্যে দিয়ে।

স্যর সৈয়দ আহমদ খান

স্যর সৈয়দ আহমদ জাতীয়তা-বিরোধী মানুষ ছিলেন না। কিন্তু জাতি বিষয়ে তাঁর ভাবনার সঙ্গে কংগ্রেসের ভাবনার অমিল ছিল। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সরাসরি বিরোধী ছিলেন। কেন না তাঁর ধারণা কংগ্রেস আসলে সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের প্রতিনিধি-সভা। তিনি মুসলিমদের জাতীয়

বদরুদ্দিন তৈয়াবজি

কংগ্রেসে যোগ না দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। যদিও অন্যান্য মুসলিম নেতা যেমন, বদরুদ্দিন তৈয়াবজি কংগ্রেসেই যোগদান করেছিলেন। উত্তর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্যর সৈয়দের নেতৃত্ব সকলে মেনে নেননি। সৈয়দ আহমদের পাশ্চাত্যকরণের বিষয়টিকে উলেমা কখনোই পছন্দ করেনি। তাঁরা নিজের প্রাধান্য নষ্ট হবার আশঙ্কায় ইসলামীয় সর্বজনীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জামালউদ্দিন আলআফগানির মতো গোঁড়া উপনিবেশ-বিরোধী ব্যক্তিত্ব।

সৈয়দ জামালউদ্দিন আল আফগানি

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্যর সৈয়দ আহমদের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান- রাজনীতির ভরকেন্দ্র রূপে আলিগড় গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। সেই সময় আলিগড়ের তরুণ প্রজন্মরাও উপযুক্তভাবে সংগঠিত হয়নি। সনাতন মুসলমান সমাজকে এড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যমে নিজেদের দাবিগুলিকে সফল করে তোলার পন্থা তাঁদের অসাড় মনে হয়েছিল। বিংশ শতকের শুরুতে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির মতো তরুণ প্রজন্মের নেতারা উলেমা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে ভারতের মুসলমান রাজনীতির মধ্যে ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া জোরদার হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের থেকে মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে

আছে সেই যুক্তি প্রবল হয়। অতএব সেই সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দূর করবার জন্য হিন্দু ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েরই বিরুদ্ধে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা আশু প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

টুকরো কথা

মুসলিম লিগ

বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টি নতুন করে জাতীয়তাবাদী নেতাদের নজরে পড়ে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 'পিছিয়ে পড়া' মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণির কাছে বেশ কিছু সুযোগের সম্ভবনা তুলে ধরা হয়। শিক্ষা, চাকরি, ও রাজনীতিতে সুযোগ